ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5
Volume- I, Issue-VI, July, 2025, Page No. 1628-1634
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.06W.171

বিশ শতকের বাংলার আয়ুর্বেদচর্চায় দুই আয়ুর্বেদবিদ: ব্যক্তি থেকে প্রতিষ্ঠান

শুভঙ্কর কুণ্ডু, *গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 07.07.2025; Accepted: 10.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

From the early part of the 20th century, a renewed wave of interest in Ayurvedic practice emerged in Bengal. While from ancient India up to the 19th century, the practice of Ayurveda largely followed a hereditary lineage, in the 20th century, this tradition was broken as Bengali Ayurvedic practitioners began institutionalizing Ayurvedic studies through personal initiatives. On February 10, 1916, the first school dedicated to Ayurvedic practice was established in Kolkata, named the 'Ashtanga Ayurveda College'. Following this, on April 14, 1921, the 'Vaidyashastra Pith' was founded, and in 1932, the 'Vishwanath Ayurved Mahavidyalaya and Hospital' was established. These were all collectively formed centers for Ayurvedic studies. However, in 20th-century Bengal, there were two Ayurvedic practitioners who, driven by personal interest, studied Ayurveda on their own and later went on to establish Ayurvedic colleges and hospitals independently. These two Ayurvedic scholars were Kaviraj Raghunath Maity and Kaviraj Nanigopal Sarkar. The institutions—colleges and hospitals—that they founded in two different districts of Bengal continue to operate today as non-governmental institutions, providing Ayurvedic education and healthcare services. The adverse and challenging circumstances under which these two institutions were established are nothing short of remarkable. Therefore, this article aims to present the history of these two Ayurvedic practitioners of 20th-century Bengal and the institutions they founded.

Keywords: Kabiraj, Ayurveda, College, Hospital, Bengal

১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার পর যখন পশ্চিমি চিকিৎসা ব্যবস্থার কাছে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়ল, তখন বাংলার তথাকথিত কবিরাজ বা বৈদ্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা এই চিকিৎসাব্যবস্থার প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা নিতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু, তখনও পর্যন্ত বাংলায় আয়ুর্বেদচর্চার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে দেখা যায়নি। বিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই বাংলায় প্রতিষ্ঠিত নানান প্রতিষ্ঠানগুলিতে আয়ুর্বেদচর্চার উদ্যোগ দেখা যায়। ডন সোসাইটি (১৯০২ খ্রিষ্টাব্দ), বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ (১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দ), কলকাতা আয়ুর্বেদ সভা (১৯১২ খ্রিষ্টাব্দ), বঙ্গীয় আয়ুর্বেদ মহামণ্ডল (১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ) আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ব্যবস্থাকে উন্নত ও ত্রুটিমুক্ত করার লক্ষ্যে আয়ুর্বেদের প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছিল।[১] এরপর ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দের ১০ ফেব্রুয়ারি কবিরাজ যামিনী ভূষণ রায়ের হাত ধরে প্রথম আয়ুর্বেদচর্চার জন্য বিদ্যালয় গড়ে তোলা হয় কলকাতায়, যার নাম হল 'অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজ' (বর্তমানে এটি যামিনী ভূষণ রাজ্য আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল নামে পরিচিত)। এরপর একে একে ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে ১৪ এপ্রিল কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতির তৎপরতায় 'বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ' (বর্তমানে এটি ইনস্টিটিউট অফ পোস্ট গ্রাজুয়েট আয়ুর্বেদিক এডুকেশন অ্যান্ড

রিসার্চ অ্যাট শ্যামাদাস বৈদ্য শাস্ত্রপীঠ হাসপাতাল নামে পরিচিত) এবং ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে গণনাথ সেনের হাত ধরে 'বিশ্বনাথ আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয়' গড়ে ওঠে।

উপরিউক্ত তিনটি আয়ুর্বেদ কলেজ ও হাসপাতালই বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে আয়ুর্বেদচর্চার শিক্ষা ও পরিষেবা প্রদান করে আসছে। মূলত তিনজন কবিরাজের হাত ধরে এই তিনটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও, বিশ শতকের কলকাতার বহু কবিরাজ এই প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠা করতে এগিয়ে এসেছিলেন এবং কেউ কেউ একইসঙ্গে দুটো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এমনও লক্ষ করা যায়। যামিনী ভূষণ রায় এবং গণনাথ সেন পশ্চিমি চিকিৎসা বিদ্যায় পড়াশোনা করে, ডাক্তারি ডিগ্রী লাভ করার পর, আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় আগ্রহী হয়ে এই চিকিৎসার প্রচার ও প্রসারে জীবন অতিবাহিত করেন। কিন্তু, বিশ শতকের বাংলায় কলকাতা শহরতলির বাইরে থেকেও পূর্বে কোনো রকম ডাক্তারি ডিগ্রী না-থাকা সত্ত্বেও, কেবলমাত্র ব্যক্তিগত আগ্রহেই আয়ুর্বেদ নিয়ে চর্চা ও পরবর্তীকালে কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে, বাংলায় আয়ুর্বেদচর্চায় নিজেদের নাম স্মরণীয় করে রেখেছেন কবিরাজ রঘুনাথ মাইতি ও কবিরাজ ননীগোপাল সরকার। যদিও তাঁদের এই দুই প্রতিষ্ঠানই বর্তমানে অ-সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত, তবুও একথা স্বীকার করতেই হবে যে, উত্তর চব্বিশ পরগণা ও পূর্ব মেদিনীপুরে অবস্থিত এই দুই প্রতিষ্ঠান বর্তমানে আয়ুর্বেদচর্চার প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। বাংলার এই দুই কবিরাজদ্বয়ের জীবনী ও কলেজ-হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কথা নীচে আলোচনা করা হল।

কবিরাজ রঘুনাথ মাইতি:

১৯০২ খ্রিষ্টাব্দের ২০ জানুয়ারি (৬ মাঘ, ১৩০৯ বঙ্গাব্দ) মেদিনীপুর জেলার কাঁথির মানিকজোড় গ্রামের এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে কবিরাজ রঘুনাথ মাইতির জন্ম হয়। তাঁর বাবা ছিলেন রামমোহন মাইতি ও মা ছিলেন সুশীলা দেবী। তিনি ছিলেন তাঁর বাবা-মায়ের ষষ্ঠ সন্তান। মাত্র দশ বছর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। ছোটোবেলা থেকেই পড়াশোনায় অত্যন্ত মেধাবী ও পরিশ্রমী ছিলেন তিনি। বাগান পরিচর্চা ও গাছ-গাছড়ার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল ছোটোবেলা থেকেই। কাঁথির স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তিসহ প্রথম স্থান লাভ করে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় আসেন। বিজ্ঞানী হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে বঙ্গবাসী কলেজে বিজ্ঞান নিয়ে আই.এস.সি.-তে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করায় তাঁকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয় খিদিরপুর ডক জেলে। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তাঁকে কলেজ ছাড়তে হয়েছিল। ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে শ্যামাদাস বাচস্পতির বৈদ্যশাস্ত্রপীঠে তিনি আয়ুর্বেদের চর্চা শুরু করেন। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে উক্ত কলেজ থেকে 'বৈদ্যশাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন ও পরে সংস্কৃত সাহিত্যে পাণ্ডিত্য অর্জন করায় তিনি 'কাব্যতীর্থ' উপাধি পান।[২] কলকাতায় থাকাকালীন তিনি বেলুড়ে গিয়ে স্বামী সারদানন্দের কাছে দীক্ষা নেন। গ্রামে ফিরে এসে অসুস্থ দরিদ্র মানুষদের চিকিৎসার জন্য ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন 'আয়ুর্বেদ মন্দির'। চিকিৎসক হলেও তিনি ছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। ব্রিটিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কাঁথির গোপালপুর ও ঠাকুরচকে বিপ্লবী শিবির গড়ে উঠলে তিনি সেখানকার অধ্যক্ষের ভার গ্রহণ করে যুবকদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে আবারও গ্রেপ্তার করা হল তাঁকে। এবার তাঁকে হিজলী জেলে নিয়ে গিয়ে তাঁর ওপর ব্যাপক শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করা হয়। ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস রোগে আক্রান্ত হলে, বেশ কিছুদিন অজ্ঞান থাকার পর তাঁর বাঁদিকটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এই দেহ নিয়েই কাঁথিতে ফিরে এসে পুনরায় আয়ুর্বেদ চর্চায় মনোনিবেশ করেন। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে দরিদ্র বহু মানুষকে আসামী করে ইংরেজ সরকার পক্ষ রাজনৈতিক মামলা দায়ের করেন। এইসব বিপন্ন মানুষকে সাহায্য করার জন্য তিনি টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে আয়ুর্বেদের প্রগতি ও উন্নতির উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করেন 'আয়ুর্বেদে সেবক সংঘ'। ১৯৪৯ সালে আয়ুর্বেদ সেবক সংঘের পরিচালনাতেই গড়ে তুললেন 'বৈদ্যক পাঠশালা' নামে অবৈতনিক আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয়। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে তদকালীন সভাপতি বিপিন বিহারী অধিকারীর প্রচেষ্টায় শ্রীকান্ত কুমার বেরা ধর্মদাসবাড়ে তাঁর নিজস্ব ১২৮ ডেসিবেল জমি দান করেন রঘুনাথ মাইতির এই সাহসী উদ্যোগের জন্য। পরবর্তীকালে এখানেই আয়ুর্বেদ কলেজ স্থানান্তরিত হয়। ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলায় বিধ্বংসী বন্যায় জেলার বিভিন্ন স্থানে তিনি দাতব্য চিকিৎসার শিবির গড়ে তোলেন। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ৯-১১ এপ্রিল তাঁর প্রচেষ্টায় আয়ুর্বেদ সম্মেলন ও প্রদর্শনী হয়েছিল কাঁথি প্রভাতকুমার কলেজে। তিনি দীর্ঘদিন নিজ প্রতিষ্ঠিত মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি হল *হোমশিখা, জাগরণী, স্বরাজ ও সঙ্গীত,*

মহাত্মাগান্ধী সংক্ষিপ্ত আত্মকথা, জাতির জনক গান্ধীজী, গান্ধীজীর স্বদেশী, অম্লপিত্ত ও পরিণামশূল, আয়ুর্বেদ প্রদর্শিকা, আয়ুর্বেদ পুনরুত্থান, আয়ুর্বেদ কি ও কেন? আয়ুর্বেদীয় রোগ চিকিৎসার সংকট ও তাহার প্রতিকার, আয়ুর্বেদের নানা সমস্যা ও তাহার প্রতিকার, Reflection of the chopra committee on the indigenous system of medicine, রোগ চিকিৎসায় আয়ুর্বেদ, শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা।[৩] ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ নভেম্বর তিনি মারা যান।

রঘুনাথ আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয় ও হাসপাতাল (১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দ):

কবিরাজ রঘুনাথ মাইতি ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে শ্যামাদাস বাচস্পতির বৈদ্যশাস্ত্রপীঠে আয়ুর্বেদের চর্চা এবং উক্ত কলেজ থেকে 'বৈদ্যশাস্ত্রী' উপাধি লাভ করার পর আয়ুর্বেদের প্রগতি ও উন্নতির উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন 'আয়ুর্বেদে সেবক সংঘ'। ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে আয়ুর্বেদ সেবক সংঘের পরিচালনাতেই গড়ে তুললেন 'বৈদ্যক পাঠশালা' নামে অবৈতনিক আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে সংঘের তৎকালীন সভাপতি বিপিন বিহারী অধিকারীর প্রচেষ্টায় শ্রীকান্ত কুমার বেরা ধর্মদাসবাড়ে তাঁর নিজস্ব ১২৮ ডেসিবেল জমি দান করায়, কলেজ ও হাসপাতালটিকে এখানে স্থানান্তরিত করা হয়। এখানে আয়ুর্বেদতীর্থ [A.S.F. (Ayurvedic State Faculty)] কোর্স পড়ানো হত, যার সময়সীমা ছিল ৩ বছর। বাংলা ভাষায় এই কোর্সটি পড়ানো শুরু হয়েছিল মাত্র পাঁচজন ছাত্র নিয়ে। বাংলার বাইরে থেকেও বিহার, ওড়িশা ও ত্রিপুরা থেকে ছাত্ররা এখানে আয়ুর্বেদ পড়তে আসত। কবিরাজ রঘুনাথ মাইতি প্রথম থেকে আমৃত্যু এই কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। কলেজের সঙ্গে যুক্ত অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন কবিরাজ বিপিনবিহারী শাস্ত্রী, কবিরাজ নীলকণ্ঠ প্রধান, কবিরাজ হেমন্ত কুমার বেরা, কবিরাজ অমলেন্দু নাথ পাল, কবিরাজ অবিনাশ গিরি, কবিরাজ হরিশচন্দ্র পণ্ডা। এখানে আয়ুর্বেদের আটটি ভাগই অর্থাৎ শল্যতন্ত্র, শালক্যতন্ত্র, কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র, বাজিকরণতন্ত্র পড়ানো হত। ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত পত্রিকার একটি বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় যে, কলেজে পড়ার ও থাকার জন্য শিক্ষার্থীদের কোনো অর্থ ব্যয় করতে হত না। ছাত্রদের অধ্যয়ন, থাকা খাওয়া প্রভৃতি সমস্ত ব্যয়ভার কলেজ কর্তৃপক্ষই বহন করত।[৪] ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চলা এই কোর্সটি প্রায় ১০০০ জন শিক্ষার্থী সফলভাবে শেষ করেছিলেন বলা জানা যায়।[৫]

১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে এখানে বহির্বিভাগ চালু হয়। ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে এখানে অন্তর্বিভাগ বা আরোগ্যশালা চালু করা হয়। প্রথমে মাত্র ৭টি শয্যার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, পরে তা বেড়ে হয়েছিল ১২টি।[৬] ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে এর নামকরণ করা হয় 'শ্রীমন্ত আরোগ্য নিলয়'।[৭] ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে কবিরাজ রঘুনাথ মাইতির মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে মহাবিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ৯ মার্চ সর্বসম্মতিক্রমে বৈদ্যক পাঠশালার নাম 'রঘুনাথ আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয়' করার সিদ্ধান্ত নেয়। ঐ দিন থেকেই এই প্রতিষ্ঠানটি রঘুনাথ মাইতির নামে পরিচিত হয়ে আসছে। ১৯৮০ সালে ভারতীয় চিকিৎসা কেন্দ্রীয় পরিষদ (Central Council of Indian Medicine) এর পক্ষ থেকে সারাদেশে B.A.M.S. (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery) কোর্সটি চালু হলে পশ্চিমবঙ্গে কেবলমাত্র তিনটি কলেজই (যামিনী ভূষণ রাজ্য আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, ইনস্টিটিউট অফ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট আয়ুর্বেদিক এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ অ্যাট শ্যামাদাস বৈদ্য শাস্ত্রপীঠ হাসপাতাল, বিশ্বনাথ আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয় ও হাসপাতাল) আয়ুর্বেদ শিক্ষা প্রদানের জন্য অনুমতি পায়। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে আয়ুর্বেদের পাঠদান বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে এই সময় এখানে আয়ুর্বেদ শিক্ষার পঠনপাঠন বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু, হাসপাতালের পরিষেবা চলতে থাকে।

একুশ শতকে এই প্রতিষ্ঠানে B.A.M.S. কোর্সটি চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। নানান বাধাবিপত্তি পার হয়ে, বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার আর্থিক সাহায্যের মাধ্যমে এই কোর্স চালু করার শর্ত পূরণ করা সম্ভব হয়। শর্ত ছিল কমপক্ষে ৫০ জন ছাত্র ও ১০০ বেডের হাসপাতাল থাকতে হবে। নিরন্তর প্রচেষ্টার পর ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠানটি C.C.I.M. এর পক্ষ থেকে B.A.M.S. কোর্সটি চালু করার অনুমতি পায়।[৮] পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় (West Bengal University of Health Sciences) এর অধীনস্থ এই প্রতিষ্ঠানটি আয়ুর্বেদের স্নাতক স্তরের কলেজ হিসেবে ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে ৫০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে প্রথম B.A.M.S. কোর্স শুরু করে।[৯]

১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে এই কলেজ চত্বরে একটি ভেষজ উদ্যান তৈরি করা হয়েছিল, বর্তমানে এখানে ১০০ টিরও বেশি ভেষজ উদ্ভিদ আছে। হাসপাতালে ১৪ টি বিভাগ (কায়চিকিৎসা, শল্যতন্ত্র, শালক্যতন্ত্র, প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ, কৌমারভৃত্য, পঞ্চকর্ম, দ্রব্যগুণ, রসশাস্ত্র, নিদান, স্বাস্থ্যভৃত্য, অগাদতন্ত্র, সংহিতা ও সিদ্ধান্ত, শারীরকার্য এবং শারীর রচনা) ছাড়াও একটি গ্রন্থাগার ও প্যাথলজিক্যাল টেস্টের জন্য একটি ল্যাবরেটরি আছে।[১০]

কবিরাজ ননীগোপাল সরকার:

১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ সেপ্টেম্বর ঢাকা জেলার আটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন সীতানাথ সরকার ও মা ছিলেন কোমদাময়ী সরকার। ঢাকা জেলার আটি গ্রামের আটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সীতানাথ সরকারের অবসর সময়ের কাজ ছিল ননী ও তাঁর বন্ধুদের নিয়ে গ্রামে ঘুরে ঘুরে উপকারী গাছগুলো চিনিয়ে দেওয়া। ভেষজ উদ্ভিদ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান বাবার কাছেই পেয়েছিলেন ননীগোপাল। মাকে হারিয়ে তিনি কাছে পেয়েছিলেন তাঁর থেকে ষোলো বছরের বড় দিদি পারুলবালাকে। পারুলবালার বিয়ে হয়েছিল ঢাকার অন্তর্গত গাইবান্ধা গ্রামের কবিরাজ অশ্বিনীকুমার দের সঙ্গে, যিনি কবিরাজি চিকিৎসায় 'ভিষগরত্ন' উপাধি প্রাপ্ত হয়ে ঢাকার সাধনা ঔষধালয়ে কর্মরত ছিলেন। তিনি পরবর্তীকালে অশ্বিনী কবিরাজ নামে পরিচিত ছিলেন। ননীগোপাল জামাইবাবু অশ্বিনীবাবুর সংস্পর্শে এলে গাছগাছড়ার গুণাবলী নিয়ে পুনরায় তাঁর আগ্রহ বেড়ে ওঠে। তিনি আয়ুর্বেদচর্চায় মনোনিবেশ করেন। স্থানীয় আয়ুর্বেদ শিক্ষাকেন্দ্র থেকে 'ভেষজরত্ন' উপাধিতে ভূষিত হন। এরপর আয়ুর্বেদচর্চাই হয়ে ওঠে তাঁর কাছে ধ্যানজ্ঞান হয়ে ওঠে। ১৯৪৭ এ দেশভাগের আগে ননীগোপালবাবু প্রথম কলকাতায় আসেন। ২৪ পরগণা, নদিয়া, হুগলী, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চল পর্যবেক্ষণ করে তিনি ২৪ পরগণার নৈহাটিকে আয়ুর্বেদচর্চার উৎকৃষ্ট কেন্দ্র বলে মনে করেন। ঢাকায় ফিরে গিয়ে জামাইবাবুকে তাঁর পরিকল্পনার কথা বললে অশ্বিনীবাবু নৈহাটি এসে দেখে গিয়ে ননীবাবুকে সমর্থন করেন। ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে ননীবাবু নৈহাটির অরবিন্দ রোডের ফেরিঘাট অঞ্চলে বাড়িভাড়া নিয়ে বসবাসের সঙ্গে একটি কবিরাজি ঔষধালয় স্থাপনের চেষ্টা করেন।

অশ্বিনীবাবুর প্রচেষ্টা ও ননীবাবুর আগ্রহে আয়ুর্বেদ ঔষধালয় স্থাপনের জন্য এবং এজেন্সির জন্য আবেদন করা হয়। কিছুদিন পর অশ্বিনীবাবু ঔষধালয় খোলার অনুমতি পান। এই সময় ননীবাবু অশ্বিনীবাবুকে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সামগ্রী ও একটি কারখানা স্থাপনের জন্য ৮০০০ টাকা দিয়ে সাহায্য করেন। এই দোকানের নাম ছিল 'ভবানী ঔষধালয়, ঢাকা'। মালিকানা ছিল অশ্বিনীকুমার দে-র নামে। ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধির জন্য ননীবাবু অক্লান্ত পরিশ্রম করতে থাকেন। কিছুদিন পর তিনি তাঁর পরিবারকে নিয়ে শ্রীরামপুরে বাড়িভাড়া করে চলে আসেন। ব্যবসা সম্পর্কিত ব্যাপারে জামাইবাবুর সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি শ্রীরামপুরেই স্বাধীনভাবে আয়ুর্বেদ চর্চায় মন দেন। ওখানে 'ভবানী ঔষধালয়, ঢাকা' নামে ব্যবসা শুরু করেন। এখানে তিনি রোগী দেখার ব্যবস্থাও করেন, প্রধান কবিরাজ ছিলেন ননীবাবুর পিতা সীতানাথ সরকার। এখানকার ব্যবসা যখন উন্নতির মুখ দেখল, তখন ননীবাবু তাঁর ভাই মুকুলের ওপর এখানকার ব্যবসার ভার দিয়ে মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জে 'ভবানী ঔষধালয়, ঢাকা' নামেই একটি শাখা খোলেন। তাঁর বাবার মৃত্যু হওয়ায় মুর্শিদাবাদের ঔষধালয় সেখানকার কর্মচারীদের কাছে বিক্রি করে শ্রীরামপুরে চলে আসেন। কারণ, সীতানাথ কবিরাজের মতো দক্ষ চিকিৎসকের অভাবে শ্রীরামপুরের চিকিৎসালয়ে অবনতি দেখা দিতে থাকে। তিনি রণজিৎ ভৌমিক নামে একজন বিশিষ্ট কবিরাজকে এনে এই চিকিৎসালয়ে নিযুক্ত করেন। কিছুদিন পর আবার মত পরিবর্তন করেন। শ্রীরামপুরের পাট চুকিয়ে এবার চললেন বনগাঁর পথে।

বনগাঁতে গিয়েও 'ভবানী ঔষধালয়, ঢাকা' স্থাপন করেন। রণজিৎ বাবুর থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা বনগাঁতে করলেও ননীবাবু নৈহাটি-বনগাঁ যাতায়াত করতেন। কিন্তু, তা আর বেশিদিন করতে পারলেন না। রণজিৎ কবিরাজকে বনগাঁর ঔষধালয় বিক্রি করে তিনি নৈহাটিতে এসেই ব্যবসায় মন দিলেন। এখানকার ব্যবসায় ব্যাপক উন্নতি হতে লাগলেও, ননীবাবু নিজে এককভাবে কিছুতেই কিছু করে উঠতে পারছিলেন না। তিনি একবার কাঁকিনাড়া স্টেশনের পূর্বদিকে গাছপালা সংগ্রহের জন্য গিয়ে দেখেন, এই অঞ্চলটি সম্পূর্ণ অনুন্নত এবং বেশিরভাগই পূর্ব পাকিস্তানের লোক। তিনি মনস্থির করেন, এখানেই কিছু একটা করতে হবে। কাঁকিনাড়ার রথতলা ফিঙাপাড়া অঞ্চলে ১৯৫০-৫১ খ্রিষ্টাব্দে এক বিঘা জমি কিনে নেন, তখন অশ্বিনীবাবু তাকে ৪০০০ টাকা দিয়ে সাহায্য করেন। এখানেই তিনি পুনরায় আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় মনোযোগ দেন। রোগী দেখার পাশাপাশি ওষুধ তৈরি ও তা বিক্রি তিনি নিজেই করতেন। ব্যবসায় পুরোপুরি মনোনিবেশ করতে হলে সরকারি স্বীকৃতি তথা লাইসেন্সের প্রয়োজন। ইতিমধ্যে তিনি এই

অঞ্চলের জাতীয় কংগ্রেস দলের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন। সরকারি অফিসে আবেদন করার এক বছরের মধ্যেই তিনি প্রয়োজনীয় অনুমতি পেয়ে যান। ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন 'সারদা ঔষধালয়, ঢাকা', যার একক মালিক হলেন ননীগোপাল সরকার। তাঁর স্বপ্ন পূরণ হল। অল্পদিনের মধ্যেই এই ঔষধালয়ের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৫০ সালে নৈহাটি থেকে যখন তিনি কাঁকিনাড়া রথতলায় স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য এসেছিলেন, তখন শুধুমাত্র একটি ওষুধের দোকানই প্রতিষ্ঠা করেননি। আগেই বলা হয়েছে, তিনি ছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী। তিনি মানুষের সেবার জন্য যেকোনো কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। তিনি লক্ষ করলেন এই এলাকায় কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। প্রাথমিক অবস্থায় তিনি নিজ খরচে টালির পাঠশালা নির্মাণ করেন এবং গ্রামের প্রতিটা বাড়ি থেকে পড়ুয়া জোগাড় করে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীকালে সরকারী অর্থ সংগ্রহ করে একটি একটি করে তিনি অনেকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যেমন - শঙ্করপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, বেল্লে প্রাথমিক বিদ্যালয়, পানপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, নারায়ণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, কেউটিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, শ্রীরামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফিঙাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিশুতীর্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাদরাল কলোনি রিফিউজী প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাদরাল বিক্রম সিং হিন্দি প্রাথমিক বিদ্যালয় ইত্যাদি। পরবর্তীকালে ফিঙাপাড়া বয়েজ স্কুল, ফিঙাপাড়া গার্লস স্কুল, রথতলা রাজলক্ষ্মী বালিকা বিদ্যামন্দির এবং এই বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য বি. টি. কলেজ এবং বি. এড. কলেজ স্থাপনে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থেকে কাজ করে গেছেন তিনি। তাঁর সবথেকে বড়ো অবদান ছিল আয়ুর্বেদ কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে। এর সঙ্গেই তিনি খুলেছিলেন একটি নার্সিং স্কুল।[১১] যেটি থেকে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ স্টেট নার্সিং কাউন্সিলের ডিপ্লোমা কোর্সের অন্তর্গত কোর্স করানো হয়। ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল ও নৈহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পেছনেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সেই সময় কাঁকিনাড়া আর শ্যামনগরের মাঝে কোনো রেল স্টেশন ছিলনা। সুন্দিয়াপাড়ার পূর্বপশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসীরা সেই সময় ভাটপাড়ার বিধায়ক সত্যনারায়ণ সিং ও ননীগোপাল সরকারের কাছে একটি রেলস্টেশন প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন করেন। তাঁরা তখন তৎকালীন রেলমন্ত্রী এ.বি.এ. গণি খান চৌধুরীর কাছে চিঠি লিখে আবেদন করেন। ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল কাছে থাকায় একটি ছোটো আকারের স্টেশনের কাজ শুরু হয়। ননীবাবু স্টেশনটির নাম 'বঙ্কিমচন্দ্র' দিতে চাইলে, সত্যনারায়ণ স্টেশনটির নাম 'জগদ্দল' রাখার পক্ষে মত দেন। শেষে জগদ্দল নামটিই স্থির হয়। রেলমন্ত্রী গণি খান চৌধুরী এসে স্টেশনটি উদ্বোধন করেছিলেন।[১২]

কংগ্রেসের কর্মী হিসেবে জগদ্দল, কাঁকিনাড়া, নৈহাটি এলাকার রাজনীতিতে তিনি বেশ সুনামের সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁর কাজের ক্ষেত্রে নানান মানুষের সহযোগিতা পেয়েছিলেন, তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। সেক্ষেত্রে কখনই কোনো নির্দিষ্ট দলের প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচিত হননি। প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, অতুল্য ঘোষ, আভা মাইতি, প্রণব মুখোপাধ্যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী, দেবী ঘোষাল, মুকুল রায়, সৌগত রায়, তড়িৎ বরণ তোপদার প্রভৃতি ব্যক্তিগণের নাম এই তালিকায় পাওয়া যায়। ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে ৮ ফেব্রুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়।

বেল্লে শঙ্করপুর রাজীব গান্ধী মেমোরিয়াল আয়ুর্বেদ কলেজ ও হাসপাতাল (১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দ):

ঢাকা জেলার আটি গ্রামের আটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হলেও ননীগোপাল সরকারের বাবা সীতানাথ সরকারের নেশা ছিল গ্রামে গ্রামে ঘুরে উপকারী গাছগুলো খোঁজা। সেই খোঁজার সময় তাঁর সঙ্গী হতেন ননীগোপাল। পরবর্তীকালে জামাইবাবু অশ্বিনীকুমার দের সংস্পর্শে এসে গাছগাছড়ার গুণাবলী নিয়ে পুনরায় তাঁর আগ্রহ বেড়ে ওঠে এবং আয়ুর্বেদ নিয়ে পড়াশোনা করে তিনি 'ভেষজরত্ন' উপাধিতে ভূষিত হন। তৎকালীন ২৪ পরগণার নৈহাটিকে কেন্দ্র করে তিনি তাঁর আয়ুর্বেদ চিকিৎসা শুরু করেছিলেন। এইখানেই কাঁকিনাড়া রেল স্টেশনের পূর্ব দিকে তিনি এসে দেখেন এই অঞ্চলে কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থার নেই। তখনই ননীগোপালের সঙ্গে আলাপ হয় কাঁকিনাড়া নিবাসী কাঁচড়াপাড়া কলেজের অধ্যাপক গোলকনাথ মিশ্রের সঙ্গে। তিনি ননীগোপালকে এখানে একটি আয়ুর্বেদ হাসপাতাল গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন। ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে হাসপাতালের জন্য বেল্লে শঙ্করপুর গ্রামের কাঁচা রাস্তার ধারে এক বিঘা জমি কেনা হল। যেখানে ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে টালির ছাদের ঘর করা হয়েছিল। হাসপাতাল খোলার জন্য ননীগোপাল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে সাহায্য চাইলেও কোনোরকম সাড়া না পেয়েই তিনি নিজেই

হাসপাতাল খোলার কাজে হাত দেন। ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ সেপ্টেম্বর চিকিৎসার জন্য বহির্বিভাগ খোলা হয়। রোগীদের কাছ থেকে কোনোরকম অর্থ নেওয়া হতনা। বরং তাঁদের বিনামূল্যে ওষুধও দেওয়া হত।[১৩]

১৯৯৫-৯৬ খ্রিষ্টাব্দে 'বেল্লে শঙ্করপুর রাজীবগান্ধী আয়ুর্বেদিক সোসাইটি' নামে একটি সোসাইটি গড়ে তোলা হয়। এই সোসাইটির হস্তক্ষেপে হাসপাতালের আশেপাশে আরও কিছু জমি কেনা হয়েছিল। ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ভারত সরকারের থেকে এই হাসপাতালটিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং হাসপাতালের নাম দেওয়া হয় 'রাজীব গান্ধী মেমোরিয়াল আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল'।[১৪] সরকারের পক্ষ থেকে ২০০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে এখানে একশো শয্যার হাসপাতাল তৈরি করার উপদেশও দেওয়া হয়।[১৫]

এরপর উদ্যোগ নেওয়া হল হাসপাতালের সঙ্গে একটি আয়ুর্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠা করার। কলেজ অনুমোদনের জন্য সোসাইটির পক্ষ থেকে ভারতীয় চিকিৎসা কেন্দ্রীয় পরিষদ (C.C.I.M.) এর দারস্থ হয়েও আশানুরূপ কোনো ফল পাওয়া যায়নি। C.C.I.M. এর পক্ষ থেকে জানানো হল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন প্রয়োজন। এরপর সোসাইটির পক্ষ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আবেদন করলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রাথমিকভাবে তিরিশজন শিক্ষার্থীর পঠন-পাঠানোর জন্য স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভের পর পঞ্চাশ হাজার টাকা আবেদন ফী সহ আবেদনপত্র দিল্লীতে জমা দেওয়া হলে, দিল্লী থেকে ছয়বার পরিদর্শনের পর ২০০২ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে সর্বোচ্চ পঞ্চাশজন পড়ুয়ার ভর্তির শর্তে অনুমোদন মেলে।[১৬] ননীবাবুকে আবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে যাওয়া আসা করতে হয়েছিল C.C.I.M. এর নির্দেশে শিক্ষার্থীর সংখ্যা তিরিশ থেকে পঞ্চাশ করার অনুমোদন পাওয়ার জন্য। এরমধ্যে হাসপাতাল সংলগ্ন জমিতে কলেজ তৈরির পাশাপাশি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, ল্যাবরেটরি, গ্রন্থাগার হয়ে যাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থী সংখ্যা বাড়ানোর অনুমোদন পাওয়া যায়। কলেজে পঠন-পাঠনের কাজ শুরু হয় ইংরেজি ভাষায়। কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় এর সভাপতি ছিলেন বিনোদ চন্দ্র সরকার, সহ-সভাপতি ছিলেন ড. গোলকনাথ মিশ্র ও ড. রতন কুমার নন্দী, সম্পাদক ছিলেন ননীগোপাল সরকার, সহকারী সম্পাদক ছিলেন ড. দিলীপ সরকার ও পরেশনাথ সরকার। অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন মানবেশ ভট্টাচার্য, পরেশ মিশ্র, দেবপ্রসাদ সরকার, অবিনাশ দে, বিভূতিভূষণ ঘোষ ও অরুণ ভট্টাচার্য। কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন ডা. জয়দেব চ্যাটার্জী, সহ-অধ্যক্ষ ছিলেন ডা. তাপস মণ্ডল, অন্যান্য অধ্যাপকেরা ছিলেন ডা. রূপা মুখার্জী, ডা. মৃদুলা সাহা, ডা. সমরেন্দ্র খাঁড়া, ডা. রমেন্দ্রগোপাল সেনগুপ্ত, ডা. দেবজ্যোতি দাস, ডা. সমর বাগচি রায়, ডা. দেবাংশু শর্মা, ডা. কৃষ্ণা রায়, ডা. শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়।[১৭]

কলেজ ও হাসপাতাল সম্প্রসারণের জন্য নতুন ভবন তৈরিতে ননীবাবু ও তাঁর জামাই শিবশঙ্কর দে তাঁদের নিজ পিতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে দুটি কক্ষ নির্মাণ করেন, তাঁদের নাম দেওয়া হয় 'সীতানাথ কক্ষ' ও 'দুর্গেশ কক্ষ'। পরবর্তীকালে অস্ত্রোপচার করার ঘর নির্মাণ করার উদ্যোগ নেওয়া হলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. অরুণোদয় দে তাঁর পিতা কবিরাজ অশ্বিনীকুমার দে-র স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই ঘরটির অর্থ দান করেন।[১৮] বারাসাত লোকসভার দুবারের সাংসদ (১৯৯৮-১৯৯৯ এবং ১৯৯৯-২০০৪ খ্রিষ্টাব্দ) এবং একজন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে ডা. রণজিৎ কুমার পাঁজা সহযোগিতা করেছিলেন। তিনি এই হাসপাতালের চক্ষুবিভাগটি উদ্বোধন করেন।[১৯] পিতা শান্তিময় মজুমদারের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তাঁর পুত্র মনোজ কুমার মজুমদার হাসপাতালে এক্স-রে বিভাগটি চালু করার জন্য ১,৫৪,০০০ টাকা দান করেন।[২০] ঔষধালয়ের জন্য ১৯৮৯ থেকে ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত থাকা ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তড়িৎ বরণ তোপদারের সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে তিন কিস্তিতে ২৫,২৭,০০০ টাকা অর্থ সাহায্য করা হয়। কবিরাজ এন. সি. দাস কলেজের উন্নতির জন্য ১২,০০০ টাকা দান করেন। ল্যাবরেটরির জন্য হারাধন দে ২৫,০০০ টাকা দেন। স্থানীয় নিবাসী অশোক অধিকারী ও পরিমল সাধুখাঁ দান করেন যথাক্রমে ৩০,০০০ ও ৩,০০০ টাকা। কলেজ ও হাসপাতালে রয়েছে একটি ভেষজ উদ্যান। উদ্যানটির নাম হল 'কিচক উদ্যান'। ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে কলেজটি পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় (West Bengal University of Health Sciences) এর অধীনস্ত হয়।

তথ্যসূত্র:

১. কুণ্ডু, শুভঙ্কর। বিশ শতকের বাংলায় আয়ুর্বেদচর্চার ইতিহাস (অপ্রকাশিত এম. ফিল. থিসিস) । নদিয়া: কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২৩, পৃ: ৮৭-৮৮।
২. পাল, নীরদবরণ। ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে বঙ্গদেশে আয়ুর্বেদ চর্চা। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১১, পৃ: ১৩৯।
৩. স্মরণিকা, রঘুনাথ আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয় ও হাসপাতাল। ২০১৮, পৃ: ৯।
৪. পাল, নীরদবরণ। প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৭।
৫. https://www.raghunathayurved.com (দেখা হয়েছে ২৩/০৬/২০২৫ তারিখে) ।
৬. 'The Journey of Kaviraj Raghunath Maity from Vaidyak Path-Shala to Raghunath Ayurved Mahavidyalaya & Hospital', in Atreya, 2018, Raghunath Ayurved Mahavidyalaya & Hospital, p. 10.
৭. পাহাড়ী, সুব্রত। আধুনিক বাংলায় আয়ুর্বেদ চিকিৎসা। রচয়িতা, কলকাতা, ২০১৫, পৃ:১১০।
৮. সাক্ষাৎকার: ডা. সুশীল কুমার নাথ, অধ্যক্ষ। রঘুনাথ আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয় ও হাসপাতাল। ০৭/০৬/২০২৩ তারিখে নেওয়া হয়েছে।
৯. https://www.raghunathayurved.com (দেখা হয়েছে ২৩/০৬/২০২৫ তারিখে) ।
১০. তদেব।
১১. বসু, পঙ্কজ। মুছে যাওয়া দিনগুলি। পাবলিশিং কনসার্ন, কলকাতা, ২০১৬, পৃ: ২৪।
১২. বসু, পঙ্কজ। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬১।
১৩. তদেব, পৃ: ২৭।
১৪. তদেব, পৃ: ২৮।
১৫. তদেব, পৃ: ২৮।
১৬. তদেব, পৃ: ২৯।
১৭. সাক্ষাৎকার: ডা. তাপস কুমার মণ্ডল, অধ্যক্ষ। বেল্লে শঙ্করপুর রাজীব গান্ধী মেমোরিয়াল আয়ুর্বেদ কলেজ ও হাসপাতাল। ০৩/০৬/২০২৩ তারিখে নেওয়া হয়েছে।
১৮. বসু, পঙ্কজ। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১।
১৯. তদেব, পৃ: ৩১।
২০. তদেব, পৃ: ৩১।